দৈনিক সংবাদ 45

তারিখ 16 SEP 1990 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ব্যর্থতা ও হতাশার চিত্র

মতিউর রহমান

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার চার বোর্ডের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেলো যে, ৪ লাখ ৩৫ হাজার ৯১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩১৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, শতকরা মাত্র ৩১·৭৩ জন পরীক্ষার্থী সফলকাম হতে পেরেছে। এটা বিগত পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন হার।

দেশের প্রায় সাড়ে চার লাখ পরীক্ষার্থী শুধু নয়, তাদের পরিবারের সকলেই উদ্বেগ, উৎকন্ঠা আর আশা নিয়ে এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেলো যে, দুই–তৃতীয়াংশের অধিক ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হতে পারেনি। এখন এই বিরাট সংখ্যক ছাত্র এবং তাদের পরিবারের আশাহত অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এভাবে প্রতি বছরই এক বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে লাখ লাখ পরিবারের জীবনে যে অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে তা গোটা সমাজের জন্য এক গভীর হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

এ বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্টের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা–বিষয়ক উপদেষ্টা আলহাজ মনসুর আলী সরকার। ধারণা করা যায় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ অসুস্থ থাকায় তিনি এ সুযোগ পেয়েছেন। এসএসসি পরীক্ষার ফল শিক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ করার এ নিয়ম চালু করা হয়েছে সম্প্রতি। আগে এ রকম ব্যবস্থা ছিল না। এটা করা হচ্ছে সরকারের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য। অতীতে বোর্ডগুলো এ দায়িত্ব পালন করতো। প্রেস কনফারেন্সের দরকার হতো না।

হৈ চৈ, হট্টগোল আর সীমাহীন বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা বলেছেন যে, নকলপ্রবণতা হ্রাস এবং স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার কম হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, অন্যান্য বছরে সরকার কঠোর ছিল না, এটা মনে করার কোন কারণ নেই। দু' বক্তব্যের মধ্যে মিল কোথায়?

রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সরকার এবার অসৎ উপায় অবলম্বনে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়ার ফলে পাসের হার কম হয়েছে। এটা সরকারের সাফল্য। সরকারের দায়িত্ব কি শুধু কড়াকড়ি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? উপদেষ্টার তৃপ্ত কথাতে সেটাই মনে হয়। তবে উপদেষ্টা বলেছেন যে, শুধু এবারই কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নয়। অন্যান্য বছরও তা করা হয়েছে। অথচ প্রকাশিত ফলাফলের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৬ সালে ৬৬·৩৯, ১৯৮৭ সালে ৫৯·৯৮, ১৯৮৮ সালে ৫৪·২১ এবং ১৯৮৯ সালে ৪২·৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এ বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার হার নেমে এসেছে সর্বনিম্ন ৩১·৭৩ শতাংশে। উপদেষ্টার কথা অর্থাৎ 'অন্যান্য বছরও সরকার কঠোর ছিল' যদি সত্য হয়, তাহলে গত পাঁচ বছর ধরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার হার ক্রমাগতভাবে এ রকম আশংকাজনকভাবে কমে আসছে কেন? এ থেকে যেটা বের হয়ে আসে, তাহলো বর্তমান সরকারের অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার জন্য সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ছে। যার পরিণতিতে জাতি হিসেবে আমরা একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছি। আমরা জানি যে, একটি দেশের উন্নতি–অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষা ও শিক্ষিত জনশক্তির উপর। কিন্তু সেই শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যে করুণ পরিস্থিতি বিরাজমান তা আমাদের দেশের এক হতাশাজনক ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিতবহ।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড়ো ধরনের সোপান অতিক্রমের পরীক্ষা হলো মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। বলা যায় এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে প্রতিটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন। যারা সফল হয় তারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সোনালী ছাড়পত্র পায়। যারা ব্যর্থ হয় তারা পড়ে যায় পিছনে। তাদের তেমন কোন কিছু আর করার থাকে না। সমাজের নানা পথের আহ্বানে সিঁড়ি দিয়ে তারা আরও নীচে নেমে যায়। আবার ব্যর্থতার দুঃসহ যন্ত্রণায় আত্মহননের পথ বেছে নেয় কেউ কেউ। খুলনা থেকে এরকম দু'জন তরুণের আত্মহত্যার খবর আমরা জানতে পারি। ঢাকার একজন সে প্রচেষ্টা নিয়েও বেঁচে যায় কোন রকমে।

সেজন্য প্রতি বছরের মতো এবারও পরীক্ষার্থীদের পরিবার শুধু নয়, আমাদের সকলের দৃষ্টি ছিল মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিশেষ দিনটির দিকে। তাই দেখা যায় যে, এক মাসের অধিক সময় ধরে উপসাগরীয় সঙ্কটকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ যুদ্ধ রবের বাইরে অন্তত একদিনের জন্য আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলোর দৃষ্টি পড়েছিল সেদিকে।

মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষার ফলাফলের বিভিন্ন দিক আলোচনার আগে, ফল প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়ে দু'একটা কথা বলে নেয়া যায়। ফল প্রকাশের জন্য সাংবাদিক সম্মেলনেই শুধু হৈ চৈ হয়নি, বোর্ডগুলো থেকে ফলাফলের বই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল শুধু পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে। সে স্কুলগুলোতে ফলের বই নিয়ে রীতিমতো মল্লযুদ্ধ হয়েছে। পরীক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেখান থেকে ফল বের করে আনা। পরীক্ষা কেন্দ্র যে স্কুলগুলোতে ছিল, তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের ফল জানতে পেরেছে সহজেই। অন্য স্কুলগুলোকে বিকেল–সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকদের। অথচ, পরীক্ষা ফি (সে ফিও বাড়ছে বছর বছর) যারা দেয় তাদের একটি অধিকার হলো সময়মতো ফল জানতে পারা। সে অধিকার তাদের ছিল না। কিন্তু আমরা জানি যে, অনেকেই ফল জেনে গিয়েছিল আগেই। এমনকি পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান (সকল বোর্ড মিলিয়েও) প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রী ফল জেনেছে সেদিন সকাল সাতটায়। তার স্কুল থেকেই জানানো হয়েছে সে খবর।

গত মে মাসে দেশের ৪টি বোর্ডের আওতায় অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৪ হাজার ৮'শ' ৫০ জন। সবচেয়ে বেশী দ্বিতীয় বিভাগে। তাহলো ৮৮ হাজার ৪'শ' ৫৯ জন। এবং তৃতীয় বিভাগে ২৫ হাজার ৮ জন পরীক্ষার্থী। এবার পরীক্ষা পাসের হার সবচেয়ে বেশী রাজশাহী বোর্ডের। গতবারও তাই ছিল। অন্যদিকে, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের হার ঢাকা বোর্ডে বেশী।

বিভিন্ন বোর্ডের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অন্যান্যবারের মতো এবারও ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রাধান্য রয়েছে। ঢাকা ও কুমিল্লায় কম হলেও রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে সেটা রয়েছে।

এবার তুলনামূলকভাবে মেয়েদের ফল ভালো হয়েছে। চারটি বোর্ডের মেধা তালিকায় মোট ১৬০টি স্থানের মধ্যে মেয়েরা পেয়েছে ৪৮টি স্থান। মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণের বেশী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে, ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে মেয়েরা। কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের সম্মিলিত বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হয়েছে মেয়েরা।

প্রতিবারের মতো এবারও পত্রিকায় ফল প্রকাশের পাশাপাশি ঢাকাসহ চারটি বোর্ডের সেরা ছাত্রছাত্রীদের যারা শীর্ষস্থান পেয়েছে তাদের ছবি, তাদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের প্রথম তিনটি স্থান অধিকারীদের ছবি ছাপা হয়েছে, কয়েকটি কাগজে তাদের গর্বিত পিতামাতাদের সাথে। দেশের সেরা ছাত্রদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ–কৌতূহল রয়েছে সকলেরই। টেলিভিশনে একই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিভিন্ন বোর্ডের শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্ররা বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, ডাক্তার, কূটনীতিক বা সৈনিক হতে চায়। কিন্তু কারো কাছ থেকে এমন শোনা যায়নি যে, দেশে–বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চায়। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে আরও জানা গেলো যে, ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী সামান্তা ইসলামের গৃহশিক্ষক ছিল প্রতিটি বিষয়ে। দ্বিতীয় স্থানপ্রাপ্ত সারাহ আহমেদেরও ছিল একই রকম ব্যবস্থা। আর, তৃতীয় স্থান অধিকারী কাহাম মামুন রশীদের ছিল সাতজন গৃহশিক্ষক। দৈনিক জনতায় (৭ই সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তবে তাদের কেউ কেউ টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে সে কথা বলেনি।

গোটা পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে এমন যে, ভাল ছাত্ররাও তাদের মেধা বা পরিশ্রমের ওপর ভরসা রাখতে সাহস পায় না। প্রতিদিন কষ্ট করে পড়াশোনা চর্চার পরিবর্তে অনেকে সহজপথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পথ খোঁজে। আর সেজন্যই স্কুলে বিদ্যা অর্জন–চর্চার বাইরে গৃহশিক্ষক বা কোচিং ব্যবস্থা এখন এতো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, দুর্নীতির পথ অবলম্বন একটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নকল রোধে পুলিশকে গুলী চালাতে হয়। ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ছাত্রদের আক্রমণের শিকার হন শিক্ষকমণ্ডলী। এ সবের সাথে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, কেন্দ্র পরিবর্তন, উত্তরপত্র লিখিয়ে নেয়া, খাতার নম্বর পরিবর্তন, ভুয়া সার্টিফিকেট, জাল নম্বরপত্র ইত্যাদি অনেক কিছু।

এ বিষয়টিও বলা দরকার যে, সাধারণভাবে বহু স্কুলে পড়াশোনার মান কমে গেছে। যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। পরিশ্রমের প্রতি রয়েছে অনীহা। রয়েছে শৈথিল্য। মেধাবী বা যোগ্যতাসম্পন্নরা এ পেশাতে আসছেন না। কারণ, পেশার সুনাম আছে, কিন্তু মর্যাদা নেই। তারা সমাজে দামী ব্যক্তি নন। আগের তুলনায় বেতন বেশী হলেও বর্তমান বাজারে সেটা অপ্রতুল।

অন্যান্যবারের মতো এবারও দেখা যায় যে, মেধার তালিকায় শীর্ষস্থানে শুধু নয়, সাধারণভাবে গড়ে ভালো করেছে ভালো ভালো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। অতীতের মতো গ্রাম–মফস্বলের কোন স্কুলের ছাত্ররা সামনে আসতে পারে না। এখানে সেই বৈষম্য। গ্রামের স্কুলের চিত্র হলো জরাজীর্ণ স্কুলগৃহ, ছাদ ধসে পড়ছে, গাছতলায় ছাত্ররা ক্লাস করছে, স্কুলে শিক্ষক নেই। এ ধরনের খবরতো আমরা হরহামেশাই পাই জাতীয় দৈনিকগুলোতে। শহরের স্কুলগুলোতে এ রকম না হলেও হয়তো কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু সেগুলো গ্রামের স্কুলের তুলনায় সামান্য।

গ্রাম–শহরের ব্যবধান ছাড়াও আরেক ধরনের স্কুল রয়েছে। সেখানে দেখা যায় বৈষম্যের পরিমাণ আরও প্রকট। এগুলো ক্যাডেট কলেজ। স্বাধীনতার পর ছিল ৪টি, এখন হয়েছে ১১টি। এসব কলেজে বিশেষ সুবিধাভোগী বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা পড়ছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটি ক্যাডেট কলেজের জন্য যে সরকারী অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে হয়তো পঞ্চাশটা গ্রামীণ হাইস্কুল স্বচ্ছন্দে চালানো যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়বরাদ্দ হয় শিক্ষাখাত থেকে, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। এমনকি তাদের পরীক্ষাও হয় ব্যতিক্রমী ব্যবস্থায় অর্থাৎ স্ব স্ব স্কুল কেন্দ্রে।

এসব সমস্যা মিলিয়ে সমাজে 'বিদ্যা অমূল্য ধন' এ বিশ্বাস নয়; বরং যেকোনভাবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য হয়ে পড়ায় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির। এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ধারা রোধে কোন প্রচেষ্টা, কোন উদ্যোগ লক্ষিত হচ্ছে না। বরং পরিস্থিতির ক্রমাবনতিই লক্ষণীয়। সরকারের পক্ষ থেকে কিছুদিন পরপর ঘোষিত হয় নতুন কর্মসূচী, নতুন পদক্ষেপের কথা। সেগুলোর ফলাফল দেশবাসী কোন দিন জানতে পারে না। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করেই বলেছিলেন যে, ১৯৮৭ সালের মধ্যে শিক্ষার হার ৫০ শতাংশ করা হবে। তার কি হলো? আবার বলা হচ্ছে '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা'। এরকম গালভরা প্রতিশ্রুতি প্রদানে আমরা সম্ভবত ইতিমধ্যেই রেকর্ড ভঙ্গ করতে পেরেছি।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তাহলো যে, আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য থেকে পরিচালিত হয় না। বর্তমানেও যে ব্যবস্থা চলেছে সেটাতে ঔপনিবেশিক আমলের ব্যবস্থাকেই আরও সবল করার প্রয়াস চলেছে মাত্র। অতীতের মতো এখনও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো দেশের অধিকাংশ মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সহায়তায় দেশের মানুষের উপর শোষণ আর শাসন অব্যাহত রাখা। এরপরও মাঝে–মধ্যে যেসব কর্মসূচী নেয়া হয়, সেগুলো মূলত বাইরের জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত, দাতাদের চাপ এবং দেশের ভিতরে ভাবমূর্তি সৃষ্টির কারণে। সত্যিকার অর্থে কোন সৎ উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা হয় না। সেজন্য দেখা যায়, স্বাধীনতার উনিশ বছর হলেও এখন পর্যন্ত সাধারণভাবে গৃহীত কোন জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিটি সরকারই এ লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। একটি করে দলিলও তৈরী করেছে। কিন্তু গণবিরোধী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ছাত্র–জনতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ডঃ কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্ট। কিন্তু এই রিপোর্টকে জিয়া সরকার ও এরশাদ সরকার হিমাগারে রেখে দিয়েছে।

এখানে অন্য একটি দিকও বিশেষভাবে বিচার্য যে, আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটি দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নয়। সে লক্ষ্যও নেই। ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রাপ্ত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একটি আরোপিত ব্যবস্থা। যা নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ খর্বাকৃত। সেজন্য তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য আলোকদিশারী হতে পারছে না। বরং এ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজের বৈষম্য আর শোষণকে আরও দৃঢ়মূল করার প্রয়াসই প্রবলতর হয়ে উঠছে। গণতন্ত্র আর উন্নয়নের নামে সর্বত্র যেখানে চলেছে এক নির্বিচার দুর্নীতি আর অর্থগৃধ্নুতার আগ্রাসন, সেখানে শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন, জনশিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা সবই হলো কল্পনাবিলাস।

আজকে আমরা যে ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছি তাতে শিক্ষা পরিস্থিতি বা ব্যবস্থাকে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সবকিছু একসাথে জট পাকিয়ে গেছে, জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে খুচরো সমস্যা বের করা খুব কঠিন। তবুও তার পরও চেষ্টা নিতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সকলকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ উন্নত, শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, স্কুল–কলেজের উন্নয়ন সাধন, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধ, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম আর শহরের বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা নিতে হবে। এই সচেতন উদ্যোগ ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া কঠিন। শুধু সরকারের কাছে আশা বা সরকারের কাছে দাবী করে তা হবে না।